নিজের কিছু কথা - হুমায়ূন আহমেদ

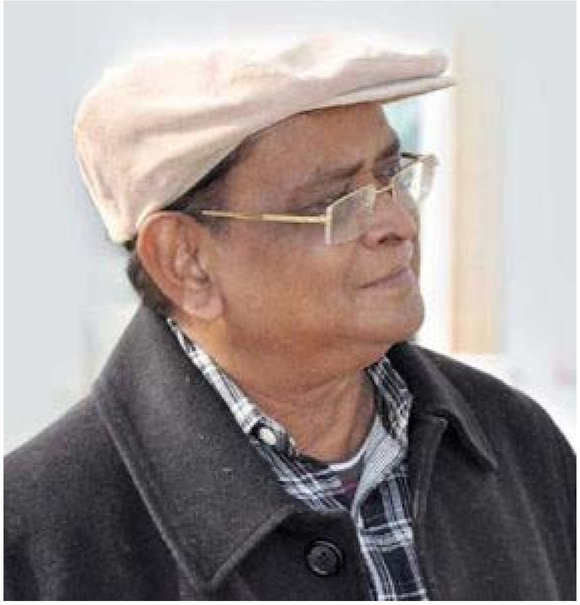

হুমায়ূন আহমেদ তাঁর বেশকিছু গ্রন্থের ভূমিকা অংশে অকপটে নিজের কথা জানিয়েছেন। তাঁর তিনটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থের ভূমিকার নির্বাচিত অংশ পত্রস্থ হলো...

উপন্যাস সমগ্র ১ম খণ্ড

নিজের কিছু কথা

কুড়ি বছর আগের কথা।

বর্ষার রাত। বাইরে ঘন ঘন বিজলি চমকাচ্ছে। আমি বইপত্র মেলে বসে আছি। থার্মোডিনামিক্সের একটি জটিল অংশ যে করেই হোক পড়ে শেষ করতে হবে।

হঠাৎ কী যেন হয়ে গেল। কেমিস্ট্রির বইখাতা ঠেলে সরিয়ে দিলাম, লিখতে শুরু করলাম

"রাবেয়া ঘুরে ঘুরে সেই কথা কটিই বারবার বলছিল।

রুনুর মাথা নিচু হতে হতে থুতনি বুকের সঙ্গে লেগে গিয়েছিল।..."

আমার প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস নন্দিত নরকে। ঐ রাতে কেন হঠাৎ উপন্যাস লেখায় হাত দিলাম, কেনই বা এরকম গল্প মাথায় এল তা বলতে পারব না।

লেখকরা যখন লেখেন তখন তারা অনেক কিছুই বলতে চান। সমাজের কথা বলেন, কালের কথা বলেন, জীবনের রহস্যময়তার কথা বলেন। লেখার ভেতর আদি প্রশ্নের উত্তর খোঁজেন আমরা কোত্থেকে এসেছি? আমরা কারা? আমরা কেনই বা এলাম? আমরা কোথায় যাচ্ছি?

নন্দিত নরকে লেখার সময় আমার বয়স উনিশ-কুড়ির বেশি নয়। এই বয়সের একজন তরুণ কি এত ভেবে-চিন্তে কিছু লেখে?

Nirjoy

আমার জানা নেই আমি শুধু জানি, ঐ রাতে একটি গল্প আমার মাথায় ভর করেছিল। গল্পের চরিত্রগুলো স্পষ্ট চোখের সামনে দেখছিলাম, ওদের কথা শুনতে পাচ্ছিলাম। ভেতরে প্রচণ্ড চাপ অনুভব করছিলাম যেভাবে ওদের দেখছি হুবহু সেইভাবে ওদের কথা বলতে হবে এবং আজ রাতেই বলতে হবে। এই মানসিক চাপের উৎস কী আমি জানি না।

এক রাতে লেখা ষাট পৃষ্ঠার এই লেখাটির কাছে আমি নানানভাবে ঋণী। এই লেখাই আমাকে ঔপন্যাসিক হিসেবে ব্যাপক পরিচিতি দিয়েছিল। এই একটি লেখা প্রকাশিত হবার পর অন্য লেখা প্রকাশে আমার কোনো রকম বেগ পেতে হয়নি।

কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে, নন্দিত নরকে আমার প্রথম উপন্যাস নয়। আমার প্রথম লেখা 'শঙ্খনীল কারাগার', প্রকাশিত হয় নন্দিত নরকের পরে।

শঙ্খনীল কারাগার উপন্যাসটির সঙ্গে আনন্দ-বেদনার অনেক স্মৃতি জড়িয়ে আছে। আমার বাবা আমার কোনো লেখাই পড়ে যেতে পারেননি এই পাণ্ডুলিপিটি পড়েছিলেন। বাবা যাতে উপন্যাসটি পড়েন সেই আশায় আমি ভয়ে ভয়ে পাণ্ডুলিপিটি তার অফিসে অসংখ্য ফাইলের এক ফাঁকে লুকিয়ে রেখে এসেছিলাম। উপন্যাস পড়ে তিনি কী বলেছিলেন, তা এই রচনায় লিখতে চাচ্ছি না। পৃথিবীর সব বাবাই তাদের পুত্রকন্যাদের প্রতিভায় মুগ্ধ থাকেন। সন্তানের অতি অক্ষম রচনাকেও তারা ভাবেন চিরকালের চিরদিনের লেখা।

'শঙ্খনীল কারাগার' উৎসর্গ করি আহমদ ছফা এবং আনিস সাবেতকে। আহমদ ছফা আমার প্রথম উপন্যাস প্রকাশের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। অসাধারণ একজন মানুষ। আনিস সাবেত আরেকজন অদ্ভুত মানুষ! রোগা লম্বা বৈশিষ্ট্যহীন এই মানুষটি হৃদয়ে ভালোবাসার সমুদ্র ধারণ করেছিলেন। মানুষ ফেরেশতা নয়। তার মধ্যে অন্ধকার কিছু দিক থেকেই যায়। আনিস সাবেতের ভেতরে অন্ধকার বলে কিছু ছিল না। সচেতন পাঠক হয়তো লক্ষ্য করেছেন, আমার অনেক উপন্যাস ও নাটকে আনিস নামটি ঘুরেফিরে এসেছে। যখনই কোনো অসাধারণ চরিত্র আঁকতে চেয়েছি, আমি নাম দিয়েছি আনিস।

তখন দেশ সদ্য স্বাধীন হয়েছে। আমি, আহমদ ছফা এবং আনিস ভাই তিন জন সারাক্ষণ একসঙ্গে থাকি। আমাদের চোখে কত না স্বপ্ন! সাহিত্যের সাধনায় জীবন উৎসর্গ করব, চিরকুমার থাকব; জীবনকে দেখার ও জানার জন্যে যা করণীয় সবই করব। তারা দু'জন তাদের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করলেন। আমি পরাজিত হলাম জীবনের মোহের কাছে।

শঙ্খনীল কারাগার উপন্যাসটি আরও একটি কারণে আমার বড় প্রিয়। এই লেখা পড়ে অষ্টম শ্রেণীর একটি বালিকা আমার সঙ্গে দেখা করতে এল। তার নাকি বইটি বড় ভালো লেগেছে। তার ধারণা, বইটির লেখকও বইটির একটি চরিত্রের (খোকা) মতো খুব ভালোমানুষ। সে এই ভালোমানুষটির সঙ্গে কিছুক্ষণ থাকতে চায়।

অষ্টম শ্রেণীর সেই বালিকা এখনো ভালোমানুষটির (?) সঙ্গেই আছে। তাকে নিয়ে সুখে-দুঃখে জীবনটা পার করেই ফেললাম। যখন পেছনের দিতে তাকাই, বড়ো অবাক লাগে।

শুধুমাত্র এই বালিকাটিকে অভিভূত করবার জন্যই আমি একটি উপন্যাস লিখি। নাম নির্বাসন। সেই উপন্যাসটি তার নামে উৎসর্গ করা হয়। বালিকা আনন্দে অভিভূত হবার বদলে ভয়ে অস্থির হয়ে যায়। তার ধারণা হয়, তার বাবা-মা যখন উৎসর্গপত্রটি দেখবেন, তখনি তাকে বাড়ি থেকে বের করে দেবেন। তার আশঙ্কা খুব অমূলক ছিল না।

'তোমাদের জন্য ভালোবাসা' এবং 'অচিনপুর' এই দুটি রচনা ময়মনসিংহ শহরে লেখা। তখন ময়মনসিংহের কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করি। কাউকেই চিনি না। কথা বলার লোক নেই, গল্প করার কেউ নেই। কিচ্ছু ভালো লাগে না। সন্ধ্যা থেকে গভীর রাত পর্যন্ত ব্রহ্মপুত্র নদের পাড়ে হাঁটাহাঁটি করি। একসঙ্গে অনেক গল্প মাথায় আসে। ইচ্ছা করে সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে দিনরাত লিখি। শুধুই লিখি। কত কথা আমার বুকে জমা হয়ে আছে। সব কথা সবাইকে জানিয়ে যেতে ইচ্ছা করে। কারো সঙ্গে দেখা হলেই মনে হয় এই মানুষটার জীবনটা কেমন? কী গল্প লুকিয়ে আছে তার ভেতরে? কিন্তু আগ বাড়িয়ে তাঁকে কিছু জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছা করে না। সব সময় নিজেকে সরিয়ে রাখতে চাই। স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি যখন ঘরের একটি নিরিবিলি কোণ পেয়ে যাই, যেখান থেকে

সামান্য একটু আকাশ দেখা যায়। এক চিলতে রোদপোষা বেড়ালের মতো পায়ের কাছে পড়ে থাকে। আমি বসে যাই কাগজ-কলম নিয়ে 'আমি বলি এই হৃদয়েরে। সে কেন জলের মত ঘুরে ঘুরে একা কথা কয়।'
লিখে যাচ্ছি ক্রমাগত। কুড়ি বছর হয়ে গেল লেখালেখির বয়স। খুব দীর্ঘ সময় না হলেও খুব কমও তো নয়। অনেক লেখকই ক্রমাগত কুড়ি বছর লিখতে পারেন না। মৃত্যু এসে কলম থামিয়ে দেয়। কেউ কেউ আপনাতেই থেমে যান। তাদের লেখার ইচ্ছা ফুরিয়ে যায়। আমার অসীম সৌভাগ্য, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে লেখার ইচ্ছা বেড়েই চলছে। আজকাল প্রায়ই বলতে ইচ্ছা করে 'জীবন এত ছোট কেন?'
এই যে এত লিখছি, কী বলতে চাচ্ছি এসব লেখায়? 'চারপাশের দুঃসময়, গ্লানিময় এবং রহস্যময় জগৎকে একজন লেখক গভীর মমতায় ভালোবাসেন' এই কি আমার লেখার সার কথা? নাকি এর বাইরেও কিছু আছে? আমি জানি না আমার জানতে ইচ্ছাও করে না। আমার ইচ্ছা করে থাক। সব কথা বলে ফেলা ঠিক হবে না। কিছু রহস্য থাকুক।

হুমায়ূন আহমেদ
শহীদুল্লাহ হল।

[উপন্যাস সমগ্র-১ম খণ্ড, প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা, ১৯৯০]

মিসির আলীর কথা

'মিসির আলির কথা' শিরোনামে নিজের কথা বলে নিই আমি। তখন থাকি নর্থ ডেকোটার ফার্গো শহরে। এক রাতে গাড়ি নিয়ে যাচ্ছি মন্টানায়। গাড়ি চালাচ্ছে আমার স্ত্রী গুলতেকিন। পেছনের সিটে আমি আমার বড় মেয়েকে নিয়ে গুটিসুটি মেরে বসে আছি। গুলতেকিন তখন নতুন ড্রাইভিং শিখেছে। হাইওয়েতে এই প্রথম বের হওয়া। কাজেই কথাবার্তা বলে তাকে বিরক্ত করছি না। চুপ করে বসে আছি এবং খানিকটা আতঙ্কিত বোধ করছি। শুধু মনে হচ্ছে, অ্যাকসিডেন্ট হবে না তো? গাড়ির রেডিও অন করা। কান্ট্রি মিউজিক হচ্ছে। ইংরেজি গানের কথা মন দিয়ে শুনতে ইচ্ছে করে না। কিছু শুনছি, কিছু শুনছি না এই অবস্থা। হঠাৎ গানের একটা কলি শুনে চমকে উঠলাম
Close Your eyes and try to see
বাঃ, মজার কথা তো! আমি নিশ্চিত, মিসির আলি চরিত্রের ধারণা সেই রাতেই আমি পেয়ে যাই। মিসির আলি এমন একজন মানুষ, যিনি দেখার চেষ্টা করেন চোখ বন্ধ করে। যে পৃথিবীতে চোখ খুলেই কেউ দেখে না, সেখানে চোখ বন্ধ করে দেখার এক আশ্চর্য ফলবতী চেষ্টা।
আরো অনেক দিন পর 'দেবী' লিখি। মিসির আলি নামের অতি সাধারণ মোড়কে একজন অসাধারণ মানুষ তৈরির চেষ্টা 'দেবী'তে করা হয় একজন মানুষ, যাঁর কাছে প্রকৃতির নিয়ম-শৃঙ্খলা বড় কথা, রহস্যময়তার অস্পষ্ট জগৎ যিনি স্বীকার করেন না। সাধারণত যুক্তিবাদী মানুষরা আবেগবর্জিত হন। যুক্তি এবং আবেগ পাশাপাশি চলতে পারে না। মিসির আলির ব্যাপারে একটু ব্যতিক্রমের চেষ্টা করলাম। যুক্তি ও আবেগকে হাত ধরাধরি করে হাঁটতে দিলাম। দেখা যাক কী হয়।
যা হল তা অভাবনীয়! পাঠকরা মিসির আলিকে গ্রহণ করলেন গভীর ভালবাসায়। তাঁদের কাছে মিসির আলি শুধু গল্পের চরিত্র হয়ে থাকল না, হয়ে গেল রক্তমাংসের একজন বিপদে যার কাছে ছুটে যাওয়া যায়।
আমাকে প্রায়ই জিজ্ঞেস করা হয়, মিসির আলি বলে কি আসলেই কেউ আছে? এই চরিত্রটি কি আমি কাউকে দেখে তৈরি

Nirjoy

করেছি? তাঁদের অবগতির জন্যে বিনীতভাবে জানাই না, মিসির আলিকে আমি দেখিনি। অনেকে মনে করেন, লেখক নিজেই হয়তো মিসির আলি। তাঁদেরকেও বিনীতভাবে জানাচ্ছি আমি মিসির আলি নই। আমি যুক্তির প্রাসাদ তৈরি করতে পারি না এবং আমি কখনো মিসির আলির মতো মনে করি না প্রকৃতিতে কোনো রহস্য নেই। আমার কাছে সব সময় প্রকৃতিকে অসীম রহস্যময় বলে মনে হয়।

মিসির আলিকে নিয়ে বেশ কিছু লেখা লিখেছি। কিছু ভুলভ্রান্তিও করেছি। যেমন 'অন্য ভুবনে' মিসির আলিকে বিয়ে দিয়ে দেয়া হয়েছে। এটি বড় ধরনের ভুল। এই চরিত্রটি বিবাহিত পুরুষ হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়। মিসির আলিকে একজন নিঃসঙ্গ মানুষ হিসেবেই মানায়, যিনি ভালবাসার গভীর সমুদ্র হৃদয়ে লালন করেন; কিন্তু সেই ভালবাসাকে ছড়িয়ে দেবার মতো কাউকেই কখনো কাছে পান না।

ভুলত্রুটি সত্ত্বেও আমার প্রিয় চরিত্রের একটি হচ্ছে মিসির আলি। মিসির আলিকে নিয়ে লিখতে আমার সব সময়ই ভালো লাগে। এই নিঃসঙ্গ, হৃদয়বান, তীক্ষ্ণ ধীশক্তির মানুষটি আমাকে সব সময় অভিভূত করেন। যতক্ষণ লিখি ততক্ষণ তাঁর সঙ্গ পাই, বড় ভালো লাগে।

হুমায়ূন আহমেদ
এলিফ্যান্ট পার্ক, ফেব্রুয়ারি-'৯৩

[মিসির আলী অমনিবাস, প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা, ১৯৯৩]

পূর্বকথা

উনিশ শ' পঁয়ষট্টি সালের কথা। ঢাকা কলেজে ভর্তি হয়েছি। বাবা-মা, ভাই-বোন ছেড়ে প্রথম থাকতে এসেছি হোস্টেলে। কিছুই ভালো লাগে না। কোনো কিছুতেই মন বসে না। দিন পনেরো অনেক কষ্টে থাকলাম। তারপর 'দূর! আর পড়াশোনা করব না' এই ভেবে রাতের ট্রেনে রওনা হয়ে গেলাম বগুড়ায়। হাতে চটি একটা রাশিয়ান বইয়ের বাংলা অনুবাদ। বইটি বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনীর। রাতের ট্রেনে গাদাগাদি ভিড়, আলোও কম, তার ওপর এক ঘুমকাতুরে যাত্রী বারবার ঘুমের ঘোরে আমার গায়ে পড়ে যাচ্ছে। এর মধ্যেই পড়তে শুরু করলাম 'ম্যাক্সওয়েলের সমীকরণ' গল্পটি। কার লেখা এখন আর মনে পড়ছে না শুধু মনে পড়ছে গল্প পড়ে আমি বিস্মিত, রোমাঞ্চিত ও মুগ্ধ। এ ধরনের গল্প তো আগে পড়িনি! এগুলি যদি সায়েন্স ফিকশান হয়, তাহলে এত দিন এইসব পড়িনি কেন? একই গল্প ময়মনসিংহ পৌঁছবার আগে আগে তিন বার পড়ে ফেললাম। আমার নেশা ধরে গেল। সেই নেশা এখনো কাটেনি। এখনো আমার প্রিয় পাঠ্যতালিকার শুরুতেই আছে সায়েন্স ফিকশান। তারাশঙ্করের 'কবি' পড়ে আমি যে আনন্দ পাই, ঠিক সেই রকম আনন্দ পাই এসিমভের 'এন্ড অব ইটারনিটি' পড়ে। সম্ভবত আমার মধ্যে কোনো গণ্ডগোল আছে।

সায়েন্স ফিকশানের প্রতি গাঢ় ভালোবাসার কারণেই হয়তো আমার তৃতীয় প্রকাশিত বইটি একটি সায়েন্স ফিকশান 'তোমাদের জন্য ভালোবাসা', প্রথম ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় 'বিজ্ঞান সাময়িকী'তে। আমার ধারণা ছিল, কেউ এই লেখা পড়বে না। পড়লেও বিরক্ত হয়ে বলবে এসব কি ছাইপাঁশ শুরু হল? সাহিত্য কোন পথে যাচ্ছে? আশ্চর্যের ব্যাপার সে রকম কিছু হল না, বরং অনেকেই আগ্রহ এবং কৌতূহল নিয়ে লেখা পড়তে শুরু করলেন। খান ব্রাদার্স এন্ড কোম্পানি বইটি প্রকাশ করলেন। বইয়ের বিষয়বস্তু নিয়ে তারা সন্দিহান ছিলেন বলেই হয়তো একটা বিজ্ঞাপন দিলেন। বিজ্ঞাপনের ভাষা এরকম

Nirjoy

'ছোটদের জন্যে লেখা বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী
তবে বড়রাও পড়িলে মজা পাইবেন।'

'তোমাদের জন্য ভালোবাসা' ভালোবাসার সঙ্গে পাঠকরা গ্রহণ করলেও আমি কিন্তু দ্বিতীয় সায়েন্স ফিকশান লেখার ব্যাপারে অনেক দেরি করলাম। প্রায় দশ বছর। কারণ খুব সহজ। আইডিয়া পাচ্ছিলাম না। বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনীর আইডিয়া 'হুট' করে মাথায় আসে না। আমার দ্বিতীয় সায়েন্স ফিকশানের 'আইডিয়া' মাথায় এল ঢাকা থেকে বরিশাল যাবার পথে লঞ্চের কেবিনে। শীতের রাত। চাদর মুড়ি দিয়ে লঞ্চের কেবিনে বসে আছি, হাতে ঢাকা থেকে কেনা একগাদা ম্যাগাজিন। হঠাৎ কেবিনের দেয়ালে দৃষ্টি আটকে গেল কুৎসিত একটা মাকড়সা ধীরে ধীরে এগোচ্ছে। আমার গায়ের রক্ত হিম হয়ে গেল। এই প্রাণীটিকে কোনো এক বিচিত্র কারণে আমি অসম্ভব ভয় পাই। ...একটি প্রকাণ্ড গ্রহে তিনটি মাত্র প্রাণী, দেখতে মাকড়সার মতো। তাদের বুদ্ধি অসাধারণ, কল্পনাশক্তিও সীমাহীন। তারা নির্জন, নিষ্প্রাণ গ্রহে ঘুরে বেড়ায় এবং সৃষ্টিতত্ত্ব নিয়ে কল্পনা করে। একসময় তাদের পরিচয় হল মানুষ নামের আরেক দল বুদ্ধিমান প্রাণীর সঙ্গে। এই হচ্ছে 'তারা তিন জন'-এর গল্প। 'অন্য ভুবন' গ্রন্থটির চিন্তা মাথায় আসে ছোট একটি মেয়েকে দেখে। মেয়েটির নাম তিন্‌নি। সে গাছের সঙ্গে কথা বলে, গল্প করে। তার গল্প বলার ধরন দেখে মনে হয়, সে গাছের প্রশ্নের জবাব দিচ্ছে; মাঝে মাঝে গাছের সঙ্গে রাগ করছে। মেয়েটির কাণ্ড-কারখানা দেখে আমার মনে হ'ত গাছের সঙ্গে আমাদের প্রাণের যোগ আছে। সেই যোগসূত্রটি এখন ছিন্ন। হয়তো বা এক সময় আমাদের ছেঁড়া সুতা জোড়া লাগবে, আমরা গাছের সঙ্গে কথা বলা শুরু করব।

'অনন্ত নক্ষত্রবীথি'তে আমি একটি চক্রের কথা বলতে চেষ্টা করেছি। চক্র এমন একটি ব্যাপার, যার শুরু নেই, আবার শেষও নেই। যে বস্তুর শুরু এবং শেষ নেই, তা হল অসীম। অথচ চক্র অসীম নয়, চক্র সসীম। 'অনন্ত নক্ষত্রবীথি' লেখার সময় আমি খুব আনন্দ পেয়েছি। নতুন 'আইডিয়া' ব্যবহার করার গাঢ় আনন্দ।

'ইরিনা' লেখার পেছনে তেমন কোনো গল্প নেই। শুধু এইটুকু বলা যেতে পারে যে, ইরিনা খুব ভেবেচিন্তে লেখা। ভবিষ্যৎ পৃথিবীর ছবি আঁকতে চেয়েছি। সমাজ ব্যবস্থাটা তখন কী রকম হবে? শোষক এবং শোষিতের প্রাচীন সম্পর্ক তখনো কি থাকবে? কারা হবে শোষিত? ভবিষ্যতের পৃথিবীতে মানুষ কি অমর হবে? অমরত্বের কোনো অভিশাপ কি তাকে স্পর্শ করবে?

হুমায়ূন আহমেদ
শহীদুল্লাহ হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
[সাইন্স ফিকশান সমগ্র, প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা, ১৯৯০]

Nirjoy